যুগান্তর

তারিখ 15 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

স্কুল জাতীয়করণে দুর্নীতি

মুসতাক আহমদ

- প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত তালিকা উপেক্ষিত
- শর্তপূরণ না করা ৫৩টির প্রস্তাব নাকচ
- গজিয়ে উঠেছে ৪১৫৯টি বিদ্যালয়

ভুয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের চেষ্টা চলছে। শর্তপূরণ করে না, প্রকল্পভুক্ত এবং সদ্য গজিয়ে ওঠা বিদ্যালয়ও এর মধ্যে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত তালিকাও মানা হচ্ছে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেতর ও বাইরের দুর্নীতিবাজদের একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ তৎপরতা চালাচ্ছে। নিজেদের অবৈধ কাজ আদায়ের জন্য মন্ত্রীর নাম ভাঙাচ্ছে তারা। এতে কাজ না হলে হুমকি-চাপ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটির সুপারিশপ্রাপ্ত এবং ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া বিদ্যালয়গুলো তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণ হবে। প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় জাতীয়করণ হওয়ার কথা নয়। আবার ২০১২ সালের পর প্রতিষ্ঠিত বা ভুয়া বিদ্যালয়ও জাতীয়করণ হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের ওই চক্রটি শর্ত পূরণ না করে স্কুলগুলো জাতীয়করণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে মোটা অংকের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মেছবাহ উল আলম ৬ জুলাই যুগান্তরকে বলেন, 'শর্ত পূরণ করে না বা প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বিদ্যালয় জাতীয়করণের চেষ্টার অভিযোগ আমিও পেয়েছি। একই নামের একাধিক স্কুল, প্যাডসর্বস্ব বা ভুয়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন চিঠি আমার হাতে বিভিন্ন সময়ে ধরাও পড়েছে। বিষয়টি আমি মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এসব ঘটনার দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

দুর্নীতি : জাতীয়করণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পেছনে থাকতে পারেন না। এই মন্ত্রণালয়েরও কেউ কেউ থাকতে পারে। তবে কে বা কারা আছে, সেটি আমরা এখনও বের করতে পারিনি। বিষয়টির প্রতি আমাদের সতর্ক নজরদারি রয়েছে।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনও নতুন নতুন স্কুল গড়ে তোলা হচ্ছে। এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে দুর্নীতি প্রাধান্য পাচ্ছে। বিদ্যালয় জাতীয়করণ হলে সঙ্গে শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয় বিষয়টিকে দুর্বৃত্তরা বড় টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। এজন্য স্কুল চালুর আগে থেকেই শুরু হয় টাকার লেনদেন। অনেক ক্ষেত্রে চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমে স্কুলের জন্য জমি কেনা হয়। পরে স্কুল জাতীয়করণের নাম করে নেয়া হয় বড় অংকের টাকা। চাকরি সরকারি করার কথা বলে 'ঘুষ' দেয়ার নামে ফের অর্থ আদায় করা হয়। এভাবে গ্রামের দরিদ্র অসহায় বেকারের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নেয়া হয়। অর্থের বিষয় প্রাধান্য পাওয়ায় মেধা যাচাইয়ের যোগ খুব বেশি থাকে না। ফলে এ ধরনের স্কুলের কোমলমতি পড়ুয়ারা মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি সূত্রগুলো জানায়, চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে উন্নিখিত খাতের নামে এই টাকা প্রথমে নেয় স্থানীয় ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতারা। ভাগ পৌঁছায় মন্ত্রণালয়ের ঘাপটি মেরে থাকা সিন্ডিকেটের সদস্যদের কাছেও। এক একটি বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য রেট ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয় বলে সূত্র জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন অনুযায়ী তৃতীয় ধাপে আবেদিত ৯৬০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ হবে। সে অনুযায়ী গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫৩৩টি স্কুল জাতীয়করণের গেজেট জারি করা হয়েছে। বাকি ৪২৭টি শর্ত পূরণ না করায় সে যাত্রায় বাদ যায়। কিন্তু কিছুদিন পর এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণের চেষ্টা ফের শুরু হয়। এখানেই শেষ নয়, তৃতীয় দফায় বাদ পড়া স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয় সদ্য গজিয়ে ওঠা ভুয়া বিদ্যালয়ও। এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ে ৫৩টি স্কুলের একটি তালিকা সম্প্রতি তৈরি করা হয়। এরপর তা অনুমোদনের জন্য গত ২ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবের কাছে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বিষয়টি টের পেয়ে যান সচিব। পরে ফাইলটি অনুমোদন না করে আরও কিছু তথ্য চেয়ে তা ফিরিয়ে দেন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, জাতীয়করণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় মনেনয়নে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত তালিকাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই তালিকার বাইরে থেকে কোনো বিদ্যালয় নিতে হলে তা পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত তালিকায় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের বাইরে বিদ্যালয়ও স্থান পেয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় সরকারিকরণ কাজে সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব নুজহাত ইয়াসমিন গত ১ জুলাই বিকালে মোবাইল ফোনে জানান, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তালিকার বাইরে বিদ্যালয় সরকারি করা যাবে না, সত্য। তবে এটাও ঠিক যে, তখন নানা কারণে অনেক বিদ্যালয় তালিকার বাইরে থেকে যেতে পারে। এ ধরনের বিদ্যালয় এখন তালিকাভুক্তির আবেদন করছে। তা বাছাই করে অনুমোদনের জন্য ফাইল উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ চাইলে তা তালিকায় উঠবে। ফাইল উপস্থাপনে দোষের কিছু নেই।

এদিকে সচিবের ফাইল ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিদ্যালয় জাতীয়করণ সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের উপকমিটির প্রধান অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী। গত ২ জুলাই এ বিষয়ে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'ফাইলটি উত্থাপন করা হলে স্যার আমাকে ডেকে বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন। পরে ফাইল অনুমোদন না করে আরও তথ্য জানতে চেয়ে ফাইল ফেরত দেন।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এই তালিকায় শর্ত পূরণ না করা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দু-একটি হতে পারে, ৩০টি নয়।' তিনি আরও বলেন, 'তৃতীয় ধাপের স্কুল জাতীয়করণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ২০১২ সালের সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অংশ নেয়ার শর্তটি প্রধান। ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৬০টির মধ্যে ৫৩৩টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। বাকি ৪২৭টি শর্ত পূরণ না করায় বাদ পড়ে যায়।'

প্রশ্ন উঠেছে, ৪ মাস আগে যেসব বিদ্যালয় শর্ত পূরণ না করায় বাদ যায়, সেগুলো কয়েক মাসের মধ্যে কী করে শর্ত পূরণ করল? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, 'শর্ত পূরণ' দেখানোর জন্য দুই ধরনের প্রচেষ্টা চলছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। এর একটি হচ্ছে যেসব বিদ্যালয় জেলা-উপজেলা কমিটির সুপারিশ পায়নি, যে কোনো অনুমোদন আদায় করা। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে নতুন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে মাঠে পাঠানো হচ্ছে। এই তদন্ত কর্মকর্তারা জেলা প্রশাসক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের পাশ কাটিয়ে মাঠপর্যায় থেকে 'ওকে' প্রতিবেদন নিয়ে আসছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে '২০১২ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত পূরণ করেছে' বলে দেখানোর চেষ্টা। এ সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) কম্পিউটার সেল। এক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে, ওই শাখার কর্মকর্তাদের হুমকি ও চাপ দিয়ে 'পরীক্ষা দিয়েছে' এমন মন্তব্য লিখতে বলা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এমন মন্তব্য লিখতে না চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর নাম পর্যন্ত ভাঙানো হয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানকালে ১৬ জুন ডিপিইর কম্পিউটার বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, 'শর্ত পূরণ করে না এমন ৫ শতাধিক বিদ্যালয়ের তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই ২০১২ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার রেকর্ড নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিদ্যালয়ের ব্যাপারে 'শর্ত পূরণ করেছে' এমন মন্তব্য লিখে দেয়ার জন্য আমাকে চাপ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে খোদ মন্ত্রীর নামও ভাঙানো হচ্ছে।' এই কর্মকর্তা বলেন, 'আমার লেখার কারণে যদি শর্ত পূরণ না করা কোনো বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়, আর ভবিষ্যতে এ নিয়ে তদন্ত হয়, প্রমাণের পর তখন আমাকে দুর্নীতিবাজ বলা হবে। আমি এই অপবাদ নিতে চাই না বলে বাস্তবসম্মত মন্তব্য দিচ্ছি। এতে মন্ত্রণালয়ের কেউ কেউ আমার ওপর ক্ষুব্ধ।'

উল্লেখ্য, জাতীয়করণ নিয়ে গড়ে ওঠা উল্লিখিত সিন্ডিকেটে মন্ত্রণালয়ে ৫-৬ বছর ধরে কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তা আছেন। এছাড়া মন্ত্রীর দফতরে বেসরকারি পর্যায়ের দু'জন কর্মকর্তা আছেন। এরাই এক্ষেত্রে নানা জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খোদ মন্ত্রীর নামও ভাঙাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের সঙ্গে স্থানীয় ক্ষমতাশালী একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষক নেতাও জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, যেসব শর্ত পূরণ না করা বা ভুয়া বিদ্যালয় জাতীয়করণের তালিকায় উঠছে বা সুপারিশ পাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি আমগাঁও চন্ডিপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে এই একই নামে দুটি বিদ্যালয় রয়েছে। আমদুয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামেও গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ীতে দুটি বিদ্যালয় আছে। জাতীয়করণের ঢেউ শুরুর পর দেশের বিভিন্ন স্থানে এভাবে একই নামে দুটি করে অসংখ্য বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এগানেই শেষ নয়, এর বাইরে নতুন গজিয়ে ওঠা বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়। মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন করা ৯৬০টি বিদ্যালয়ের বাইরে এ ধরনের আরও ৪ হাজার ১৫৯টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয় থেকেই জাতীয়করণের চেষ্টা চলছে।

এছাড়া প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে এমন বিদ্যালয়ের মধ্যে কক্সবাজারের চকরিয়ায় অবস্থিত ডা. গোপাল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহের ঈশ্বরবা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের শেখ রাসেল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও জাতীয়করণের তালিকায় উঠানো আছে। অথচ এগুলো 'বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণযোগ্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। ঘোষণায় তিনি সব বিদ্যালয় তিন ধাপে জাতীয়করণ শেষ করার কথা জানান। সে অনুযায়ী প্রথম ধাপে ২২ হাজার ৯৮১টি এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরিও জাতীয়করণ শেষ। দ্বিতীয় ধাপে স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধিত, পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটিসহ অন্যান্য বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। তবে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ শেষ হয়নি। তৃতীয় ধাপেও ইতিমধ্যে ৫৩৩টির গেজেট হয়েছে। শেখ হাসিনার আগে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একসঙ্গে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন।